পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মপদ্ধতি

এক্সপোর্ট কমপিটিটিভনেস ফর জবস প্রজেক্ট

March 2017

উপক্রমণিকা

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়ন, রপ্তানী বানিজ্যের বৈচিত্র্য আনয়ন এবং এই সেক্টরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক্সপোর্ট কমপেটিটিভনেস ফর জবস প্রজেক্ট (ইসিফরজে) শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের উৎপাদন নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার চারটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরকে চিহ্নিত করেছে, যথা: ১. চামড়া শিল্প; ২. পাদুকা শিল্প; ৩. প্লাস্টিক এবং ৪. হালকা প্রকৌশল সেক্টর। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং চামড়ার তৈরী জুতোর শিল্প অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তবে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় যেমন পশুপালন ও পশু জবাইয়ের প্রক্রিয়া এবং অপর্যাপ্ত প্রযুক্তি, পরিবেশের অবক্ষয় এবং দূর্বল শ্রম মানদন্ডের কারনে দেশের ট্যানারি বা চামড়া শিল্প বরাবরই বাধাগ্রস্থ্য হচ্ছে।

এই শিল্পের সাথে জড়িত কমপক্ষে ৬,২০০টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে যাদের বেশিরভাগই নারী শ্রমিক। গত এক দশক ধরে বাংলাদেশে জুতার উৎপাদন প্রতি চার অথবা পাঁচ বছরে দ্বিগুন হারে বাড়ছে, তবে দু:খজনক হলেও সত্য এই সেক্টরটির সাথে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের নেতিবাচক দিকগুলোর সাথে অত্যন্ত মিল রয়েছে। প্লাষ্টিক ও হালকা যন্ত্রসামগ্রী উৎপাদন সেক্টর ট্যানারি শিল্পসহ অন্যান্য অনেক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করছে তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই সব কারখানা তাদের উৎপাদিত পন্য সরাসরি বিদেশে রপ্তানী করছে। দেশের প্লাস্টিক শিল্পে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ প্রতিষ্ঠান জড়িত যেখানে প্রায় ৬০০,০০ শ্রমিক কাজ করছে। অন্যদিকে ইলেকট্রনিক্স পন্য উৎপাদন করছে প্রায় ২৫০০ প্রতিষ্ঠান যেখানে কাজ করছে ৭০,০০০ শ্রমিক। ২০১৫ অর্থবছরে এই চারটি সেক্টর থেকে রপ্তানীর পরিমান ছিল ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ সংক্রান্ত সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ি সরকারের সম্মতির (পিআইইউ) সাপেক্ষে ঋণ অনুমোদন করে থাকে আইডিএ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তরের আইইই ও ইআইএ'র চাহিদা অনুযায়ি প্রকল্পটির জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মকৌশল (ইএমএফ) প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিআইইউ। সার্বিকভাবে বলা যায় এই প্রকল্পটি পরিবেশের উপরে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে কারণ এর মাধ্যমে পরিবেশ, সামাজিক ও গুনাগুন সংক্রান্ত নীতিমালা (ইএসকিউ) ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন যেমন পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি, এতদসংক্রান্ত পাইপ, তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা সরঞ্জাম স্থাপনের সময় স্থানীয় পরিবেশের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়াও এসব সরঞ্জামের ভুল ব্যবজারের কারনেও পরিবেশের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় আরো অনেকগুলো উপ-প্রকল্প এখনও চিহ্নিত করা হয়নি, এমনকি এসব উপ-প্রকল্পের জন্য স্থানও নির্বাচন করা হয়নি। যথেষ্ট তথ্য-উপাত্তের অভাব থাকা সত্বেও প্রকল্পটির জন্য একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মকৌশল প্রনয়ন করা হয়েছে। এই পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মকৌশল (ইএমএফ) বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ রুলস ১৯৯৭ এবং বিশ্বব্যাংক প্রনীত সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ইএমএফ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত কাঠামোগত ধারণা প্রদান করবে; তবে বিনিয়োগকারীরা এসব উপ-প্রকল্পের জন্য আইইই এবং ইআইএ প্রতিবেদন তৈরি ও যথার্থ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে বাধিত থাকবেন।

প্রস্তাবিত প্রকল্প

প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের শ্রমঘন এই সেক্টরের প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হচ্ছে যার ফলে এই সেক্টরটিতে আরো গতিশীলতা আসতে পারে এবং এখান থেকে উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে আরো মূল্য সংযোজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত চারটি সেক্টরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে:

১. চামড়াজাত পণ্য
২. জুতা
৩. প্লাস্টিক ও
৪. ক্ষুদ্র ও হালকা প্রকৌশল সেক্টর

এই সেক্টরগুলোকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হচ্ছেঃ ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ; ২. বেসরকারী বিনিয়োগের আগ্রহ এবং নতুন নতুন বিনিয়োগ ও রপ্তানীর বৃদ্ধির সম্ভাবনা; ৩. প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকল্পের অতিরিক্ত সুযোগ। এই সেক্টরে যেসব বিপত্তিসমূহ রয়েছে সেগুলো মূলত বাজারে ঢুকতে পারার সুযোগ, দক্ষতার অভাব ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দূর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত দূর্বলতা। বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ও গুনগত মান, নীরিক্ষণ ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সমন্বয় করা চামড়াজাত পণ্য, জুতা, প্লাস্টিক ও ক্ষুদ্র প্রকৌশল রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এই সেক্টরগুলোকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যায়কগুলো হচ্ছেঃ ১) এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ; ২) বেসরকারী পক্ষের আগ্রহ এবং অধিক বিনিয়োগ ও রপ্তানীর সম্ভাবনা; ৩) আরো সমভাবাপন্ন প্রকল্পের সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত এই সেক্টরে যেসব প্রতিবন্ধকতাগুলো হচ্ছে বাজারে প্রবেশের সূযোগ, দক্ষতার অভাব, প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দূর্বল প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং দূর্বল অবকাঠামো। তবে মনে রাখতে হবে যে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা, প্লাস্টিক এবং ক্ষুদ্র প্রকৌশল পন্য বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, পরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন, সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ডের মতো বিষয়গুলো অপরিহার্য।

চারটি মূল কম্পোনেন্টের উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পটি সাজানো হবেঃ

১. বাজারে প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে সহযোগিতা কার্যক্রম
২. উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যক্রম
৩. অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে জন বিনিয়োগের ব্যবস্থার সুযোগ ও
৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি মূলত নির্দিষ্ট বাজারসমূহে বিনিয়োগের আস্থা ফিরিয়ে আনাসহ রপ্তানী, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি এটি সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ডব্লিউবিজি'র সামস্টিক প্রবৃদ্ধিও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। প্রথমত, প্রাক্কলিত এলাকাসমূহের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে ডব্লিউবিজি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্পটি পর্যাপ্ত গবেষণা নির্ভর কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হবে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব ধরনের পাইলট কর্মকান্ড এবং ট্রেড অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস গ্লোবাল প্র্যাকটিস (টিঅ্যান্ডসি জিপি), জবস ক্রস-কাটি সলিউশনস এরিয়া এবং আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) সমূহের বিভিন্ন অর্থায়নে বাস্তাবায়িত বিভিন্ন পাইলট প্রকল্পের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি সাজানো হবে। তৃতীয়ত, চলমান ও পরিকল্পিত ঋণ কার্যক্রমে এক ধরনের সাযুজ্য আনতে এই প্রকল্পটি বেশ ভূমিকা রাখবে। চতুর্থত, টাস্ক টিম এরই মধ্যে এই শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে এক ধরনের শক্তিশালী অংশিদারিত্ব গড়ে তুলেছে যা আসলে পরবর্তীতে এই সেক্টরে ঋণ কার্যক্রমকে আরো তরান্বিত করবে। আর সার্বিকভাবে বলা যায়, এই প্রকল্পের মধ্যে পরিকল্পিত বিভিন্ন সহযোগীতামূলক কর্মকান্ড যেগুলো বাজারে প্রবেশাধীকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে অর্থায়ন এর মতো অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতসহ বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে সহায়তা করবে।

প্রকল্পের ব্যাপ্তি

এই প্রকল্পটির কম্পোনেন্ট ও কর্মকান্ড সমগ্র বাংলাদেশেই পরিচালিত হবে। যন্ত্রসামগ্রীসমূহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কারখানায় স্থাপন করা হবে। এর ফলে এই প্রকল্পটির কার্যক্রম কারখানাগুলোর চারদেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে, বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কারখানার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে থাকা জলাশয়গুলোকে নিবীড় পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হবে। এই প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলো স্থাপন করা উচিত উপ-শহর বা শিল্প এলাকার আশে পাশে যাতে অন্যান্য আবাকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ্য না হয়। চলমান প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রাথমিক ফলাফল ও সুপারিশ অনুযায়ি এই প্রকল্পের জন্য আদর্শ স্থান হতে পাওে; ১. ঢাকা শহরের আশেপাশের এলাকায় যেখানে এই ধরনের হালকা ও সাধারণ যন্ত্র প্রকৌশল স্থাপনের সুবিধা রয়েছে; ২. ঢাকার আশেপাশে যেখানে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর মান যাচাইয়ের সুবিধা রয়েছে; ৩. চট্টগ্রামের আশেপাশে যেখানে হালকা ও সাধারন যন্ত্রপাতি ও প্লাষ্টিক কারখানার সুবিধা রয়েছে; এবং ঢাকার পাশে সাভারে যেখানে চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা শিল্পের সুযোগ রয়েছে।

আইন, নীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলঅদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের রয়েছে আইনগত নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। এই সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন নীতি ও আইনগত বাধ্যবাধকতাগুলো হচ্ছেঃ

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন/নীতি/কৌশল
- পরিবেশ সংরক্ষন আইন (১৯৯৫) ও সংশোধনী
    - বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন (ইসিএ) ১৯৯৫
    - বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ১৯৯৭
    - বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন ২০১০

- পরিবেশ নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা
- জাতীয় সংরক্ষণ নীতি ১৯৯২
- জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২

প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সরকারের নীতিসমূহ: বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ি বিভিন্ন প্রকল্পসমূহকে গ্রীন, অরেঞ্জ এ, অরেঞ্জ বি এবং রেড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও ইসিফরজে প্রকল্পে কোনো ধরনের নির্মান কার্য ও স্থাপনা সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম রাখা হয়নি, তাই এই প্রকল্পটির জন্য কোনো ধরনের পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই। তবে এই প্রকল্প থেকে কিছু যন্ত্রপাতি যেমন পরিবেশ মনিটরিং, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত যন্ত্র, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, কারিগরী পরিমাপ যন্ত্র কেনা হবে। দেশের আইন অনুযায়ি জুতা ও চামড়াজাত পন্য (সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ), প্লাস্টিক ও রাবার পন্য (পিভিসি ব্যতিত), কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও মেশিন, শিল্প-কারাখানার যন্ত্রপাতিকে অরেঞ্জ এ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। এক্সপোর্ট রেডিনেস ফান্ডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২০০,০০০ মার্কিন ডলার সমপরিমানের সেবা এবং অনুদান দেয়া হতে পারে। এই কর্মকান্ডকে ইসিআর ৯৭ অনুযায়ি 'রেড' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে হলে তাই নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে:

১. প্রস্তাবিত প্রকল্প/কারখানার ইউনিট সম্পর্কিত প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন
২. প্রস্তাবিত প্রকল্প/কারখানার ইউনিট সম্পর্কিত প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষণ (আইইই) প্রতিবেদন এবং ইউনিটসমূহের কারনে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের শর্তসমূহ এবং এর কার্যপ্রণালীর ধাপসমূহ অথবা এরই মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত নিয়মানুযায়ি পরিচালিত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদন। সেই সঙ্গে বর্জ্য নিষ্কাশন ও পরিশোধনের অবস্থান চিহ্নিতপূর্বক স্থাপনার লে-আইট পরিকল্পনা, কার্যপ্রনালীর ধাপসমূহ, নকশা এবং পরিশোধন প্লান্ট স্থাপনের সময়সীমা, (এই শর্তসমূহ মূলত প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের জন্য প্রযোজ্য)।
৩. শিল্প কারখানার ইউনিট বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন এবং অবশ্যই কার্যপ্রণালীর ধাপসমূহ, লে-আউট পরিকল্পনা, কার্যকর বর্জ্য পরিশোধন প্লান্টের নকশা (এই শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে কেবল চলমান শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পসমূহের জন্য)
৪. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'নো অবজেকশন' সনদ।
৫. নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবের বিপরীতে জরুরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে কার্যকর পরিকল্পনা।
৬. পূণর্বাসন পরিকল্পনা (যেখানে প্রযোজ্য)।
৭. যথাপ্রযোজ্য অন্যান্য তথ্যাদি

কম্পোনেন্ট ২ উৎপাদন উৎকর্ষতা পরিকল্পনা ও কম্পোনেন্ট ৩ অবকাঠামোগত বাঁধার এড়াতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচলিত প্রযুক্তির উন্নয়ন/সিএফসি এবং এর সবিধার্থে সড়ক নির্মানের প্রয়োজন হবে। এই সব কর্মকান্ডকে ইসিআর ৯৭ অনুযায়ি অরেঞ্জ বি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্যাটাগরির প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে নিম্নোক্ত ছাড়পত্র প্রয়োজন:

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৭ নির্ধারিত ফর্ম-৩ অনুযায়ি আবেদন
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৭ (২০০২ সংশোধনী) অনুযায়ি নির্ধারিত ফি
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপরে পরিচালিত প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন
- প্রকল্পের বা শিল্প-কারখানার প্রস্তাবিত ইউনিটের পরিবেশগত পরীক্ষণের প্রতিবেদন; বর্জ্য পরিশোধন প্লান্টের পরিকল্পনা, ইটিপি'র নকশা ইত্যাদি
- শিল্প কারখানার ইউনিট বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন এবং অবশ্যই কার্যপ্রণালীর ধাপসমূহ, লে-আউট পরিকল্পনা, কার্যকর বর্জ্য পরিশোধন প্লান্টের নকশা (এই শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে কেবল চলমান শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পসমূহের জন্য)
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'নো অবজেকশন' সনদ।
- নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবের বিপরীতে জরুরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে কার্যকর পরিকল্পনা।
- পূণর্বাসন পরিকল্পনা (যেখানে প্রযোজ্য)।
- যথাপ্রযোজ্য অন্যান্য তথ্যাদি

ইসিআর ৯৭ এর উপ-বিধান (৫) অনুযায়ি এবং ইসিআর ৯৭ এর প্রবিধান (৬) এর অধীনে অরেঞ্জ -এ ক্যাটাগরির একটি প্রকল্পের জন্য আবেদন করার ৩০ দিনের মধ্যে এবং অরেঞ্জ-বি ক্যাটাগরির প্রকল্পের জন্য ৬০ দিনের মধ্যে একটি লোকেশন ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয় অথবা যথাযথ শর্ত পূলণ না করতে পারলে সেই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে এক্ষেত্রে যথাযথ কারণ উল্লেখ করতে হবে।

ইসিআর ৯৭ আইনে 'সেক্টর অনুযায়ি শিল্প-কারখানার বর্জ্য বা নির্গমন মানদন্ড' দ্বারা চিহ্নিত প্রকল্পসূমহ ছাড়া উপরেল্লিখ প্রকল্পের গুনগত মান, বায়ুর মান, ঘ্রাণ, শব্দ এবং বর্জ্য সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া আছে। এই সব মানদন্ড এই ধরনের প্রকল্পের জন্য অনিবার্যভাবে বজায় রাখতে হবে। উপ-প্রকল্পসমূহ চালুর প্রথম থেকেই এই মানদন্ড বজায় রাখতে হবে। যে কোনো অবস্থাতেই এই আইনের ব্যতয় ঘটানো যাবে না। যে কোনো

অবস্থাতে এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং পরিবেশগত যে কোনো ব্যতয় ঘটলে এই আইনের কঠিন প্রয়োগের প্রবিধান রয়েছে।

এই ধরনের প্রকল্পে যেহেতু নির্মান কার্যক্রম থাকে, তাই সব ধরনের নির্মানকাজের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬ এর বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। এই আইনেও সুস্পষ্টভাবে প্রকল্পের স্বত্বাধিকারীর দায়িত্ব সম্পর্কে যেমন বলা আছে, তেমনি শ্রমিকদের দায়িত্ব সম্পর্কেও বলা আছে। এবং এতে আরো নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মানদন্ডের কথা বলা আছে। এই মানদন্ডগুলো প্রকল্পের এনভায়রনমেন্ট কোড অব প্র্যাকটিস (ইসিওপি) এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সংযুক্ত হবে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট (১৯৬৫), বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট (২০০৬), বাংলাদেশ লেবার রুলস (২০১৫) এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (২০১৫) আইনগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যেখানে প্রযোজ্য হবে - এই প্রকল্পের আওতায় সব ধরনের স্থাপনার জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছ থেকে ফায়ার লাইসেন্স প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র বা সিএফসিগুলো আধুনীক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতত হতে হবে। এছাড়া অব্যবহৃত বা ক্ষতিগ্রস্থ্য যন্ত্রপাতি দ্রুত যথানিয়মে অপসারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের জাতীয় থ্রি-আর কর্মকৌশলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে বিধিবিধান রাখা আছে তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৫ - ২০২০) নির্দেশনা অনুযায়ি চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি, উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, সরকারী-বেসরকারী বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৈচিত্রের কথা বলা আছে। সুতরাং বলা যায় যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা, কর্মকৌশল, নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করতে সক্ষম হবে।

বিশ্বব্যাংকের এনভায়রনমেন্টাল সেফগার্ড নীতি : যে কোনো প্রকল্প বাস্তাবয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশে যাতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে এবং এক্ষেত্রে সব ধরনের প্রশমন ব্যবস্থা যাতে আগে থেকেই গ্রহন করা যায় সেলক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের বেশকিছু 'সেফগার্ড পলিসি' রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ওপি ৪.০১ পরিবেশগত সমীক্ষা, ওপি ৪.০৪ প্রাকৃতিক বাসবাসের স্থান (হ্যাবিট্যাটস) এবং ওপি ৪.১১, ফিজিক্যাল কালচারাল রিসোর্স (ঐতিহ্যগতভাবে যেসব সম্পদ বিদ্যমান)। প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে একটি 'বি' ক্যাটাগরির একটি প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর জন্য পরিবেশগত সমীক্ষার প্রয়োজন হবে। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় এই প্রকল্পটির মাধ্যমে পরিবেশে তেমন কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না। তবে এই প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিকভাবে কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় কিছু স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হতে পারে এবং যেহেতু এর মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে নিয়ে কাজ করতে হবে তাই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনার সময় অবশ্যই পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। । যেহেতু ঠিক কী ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে তা প্রকল্পটির এই পর্যায়ে সুস্পষ্ট নয় তাই একটি 'ফ্রেমওয়ার্ক' কৌশল গ্রহন করা হলো। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ইএইচএস), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিধিবদ্ধ বিধান এই প্রকল্পের সব ধরনের নির্মান কৌশল এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। এনভায়রনমেন্ট কোড অব প্র্যাকটিস (ইসিওপি) এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকেও আমলে নিয়ে কাজ করতে হবে।

বেসলাইন বর্ননা:এই প্রকল্পটির এলাকা সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত। কিন্তু প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন এলাকা এখনও চিহ্নিত নয়। তাই এ মুহূর্তে একটি প্রকল্প ভিত্তিক পরিবেশ বেইজলাইন তৈরী করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইএমএফ-এ সাধারন একটি পরিবেশগত বেইজলাইন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। নিচে কম্পোনেন্ট অনুযায়ি বিবরণ দেয়া হলো:

কারখানা/প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য:

- কারাখানা/প্রতিষ্ঠানের অবস্থান
- পন্য ও সেবাসমূহ (নাম ও ইউনিটের সংখ্যা)
- কাঁচামালের ধরণ এবং উৎস
- কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে তার তালিকা এবং তা থেকে নির্গমনের সম্ভাব্য মাত্রা
- বর্জ্যের ধরণ ও ব্যবস্থাপনা
- ইটিপির অবস্থান ও সিউটিপির সুযোগ
- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য:

- কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকের মোট সংখ্যা
- কর্মস্থল ও অবকাঠামোর মধ্যে সাযুজ্য (আলোক ব্যবস্থা, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, সংযোগ সড়ক এবং কর্মস্থলে তাপমাত্রা)
- পানি, বিদ্যুত ও গ্যাস ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও ক্যান্টিনের সুযোগ

- দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি ও গুদামজাতকৃত পণ্যের তালিকা
- কারখানার অভ্যন্তরে অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা
- যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফায়ার লাইসেন্স
- নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যেমন মুখোশ, দস্তানা, চোখ ও কানের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন উপকরণ, গুনগত মান

রাসায়নিক এবং অন্যান্য উপকরণ:

- বায়ু, পানির গুনাগুন
- ঘূর্ণায়মান ও চলমান যন্ত্রপাতি
- ঝালাই, আগুন ও বিস্ফোরক
- অন্যান্য স্পর্শকাতর রাসায়নিক
- কন্দ, কম্পন, বৈদ্যুতিক ও চোখের সমস্যা
- প্রাকৃতিক
- অধিক উচ্চতায় কাজ

মনিটরিং/প্রশিক্ষণ

- কাজের পরিবেশের মনিটরিং, দুর্ঘটনা এবং আহত হওয়ার ক্ষেত্রে মনিটরিং, এবং পরিবেশগত বিভিন্ন মানদন্ডের (বায়ু/পানি) মনিটরিং
- অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ, ওএইচএস/প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের সুযোগ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন উপকরণ পাওয়ার সুযোগ

বস্তুগত কম্পোনেন্ট চিহ্নিতকরন:

বস্তুগত পরিবেশ:

- জলবায়ু (গড় বৃষ্টিপাত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা)
- ভূ-সংস্থান এবং ভূমির ধরণ
- বায়ুর অবস্থা
- ভূ-উপরিস্থিত পানির অবস্থা ও ভূ-গর্ভস্থ্য পানির মাত্রা
- ভূমির ব্যবহার

পরিবেশগত অবস্থা

- বায়ো-ইকোলজিক্যাল জোন
- কতটুকু এলাকায় গাছপালা রয়েছে তার তথ্য
- কী ধরনের গাছপালা রয়েছে তার তথ্য

প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রশমন ব্যবস্থা: এ পর্যায়ে পরিবেশগত ঝুঁকি বা প্রভাব যা চিহ্নিত করা হয়েছে তা একপ্রকার প্রাথমিক পর্যায়ের । এক্ষেত্রে বিস্তারিতএবং সুনির্দিষ্টভাবে পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে প্রকল্পটির উপ-প্রকল্পগুলো যখন বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে তখন তা নতুন কোনো ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি করে কি না তা জানা প্রয়োজন। তবে এই প্রকল্পের আওতায় যেসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়ন করা হবে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এসব প্রকল্পের ফলে পরিবেশে তাৎপর্যপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের সম্ভাবনা কম। যতটুকু বিশ্লেষন করে দেখা গেছে তাতে বলা যায় পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়টি প্রকল্পটির বাস্তবায়নের দিক থেকে যেসব কনস্ট্রাকশন (দালান নির্মান) করা হবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে পরিবেশের উপর প্রভাব কেবল কনস্ট্রাকশন সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তারপরেও পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু প্রভাবের সম্ভাবনা থেকে যায়: যেমন স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন ও যন্ত্রপাতি সৃষ্ট বর্জ্য থেকে কোনো ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। তবে এসব পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব যথোপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে।

পরিবেশের বিভিন্ন দিক ও প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে এই প্রকল্পটির জন্য উপ-প্রকল্পগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

- এমন ধরনের উপ-প্রকল্প যেগুলো পরিবেশের উপরে, বিশেষ করে জলাশয়, বনাঞ্চল, তৃণভূমি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে পারে। এই ধরনের উপ-প্রকল্পগুলোকে আসলে মূল প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হবে। এছাড়াও যে উপ-প্রকল্পের ফলে স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাব পড়তে পারে, সে ধরনের উপ-প্রকল্পও প্রস্তাবনা থেকে বাদ দেয়অ হবে।

- যে সব উপ-প্রকল্প থেকে পরিবেশের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে - এমনকি সেটি সামান্য ছোট-খাটো প্রভাবও হতে পারে। এই প্রভাবগুলোর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পাওে কারন এর জন্য নতুন করে ভূমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন নেই।
- এমন ধরনের উপ-প্রকল্প যেগুলোর থেকে সামান্য অথবা পরিবেশেন উপরে নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।

পরিবেশগত সমীক্ষা মূলায়নে স্ক্রিনিং ম্যাট্রিক্স: প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশের উপরে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তা নিরুপনে এ সংক্রান্ত সব ধরনের নিয়ামক যেমন জীববৈচিত্র্য, বস্তুগত এবং সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশগত সমীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সাধারন ম্যাট্রিক্স বা চেকলিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। চেকলিষ্টে পরিবেশগত প্রভাবকে কোনো প্রভাব নেই, স্বল্প প্রভাব, মধ্যম প্রভাব এবং মারাত্নক প্রভাব হিসেবে শ্রেনীবদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী (S ও L) প্রভাব এবং পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় প্রভাবকেও (Rও I) লীপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই চেকলিষ্টটি প্রকল্পের বিভিন্ন বাস্তবায়ন এলাকায় পূরণ করতে হবে। এই চেকলিষ্ট অনুযায়ি প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। অবশ্য যদিও এই প্রকল্পটি সার্বিকভাবে 'বি' ক্যাটাগরির একটি প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে 'এ' ক্যাটাগরিতে রুপান্তর করা যেতে পারে।

পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ:

- গাছপালা নির্মূল: এই প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণ জমিতে কনস্ট্রাকশন ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে। নির্মানস্থল প্রস্ততির সময় জমি প্রয়োজন হবে অর্থাৎ এসব জমিতে যেসব গাছপালা বা চারা রয়েছে তা সরিয়ে/কেটে ফেলতে হবে। এর ফলে জীববৈচিত্র্যর ক্ষতি হবে। একইসাথে ভূমিক্ষয়, মাটি ঢালু হতে পারে এবং ভূ-উপরিস্থিত পানির ক্ষতি হতে পারে।
- নির্গমনের কারনে বায়ু দূষণ: এই সব কারখানার বিভিণ্ন ধরনের নিগমনের ফলে বঅয়ুর গুনাগুন ক্ষতিগ্রস্থ্য হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অর্গানিক পদার্থ থেকে তীব্র গন্ধ, প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষণ হতে পারে। বিএসসি মেশিন থেকে ধূলো,তীব্র শব্দ দূষণ জনজীবনে ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। ধাতব পদার্থ কাটা যেমন ষ্টিলের শিট কাটলে সেখান থেকে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ছড়িয়ে পড়তে পারে। এগুলো পরিবেশ ও জনজীবনের জন্য ক্ষতিকর।
- পানি দূষন: এই ধরনের কারখানা বা প্রকল্প যেখানে চামড়া ও জুতার কারখানা রয়েছে সেখান থেকে পানি দূষণের সুযোগ অনেক বেশি থাকে। কারন এসব কারানায় অক্রিজেনের প্রচুর চাজি রয়েছে। জুতার কারখানঅয় অবশ্য দূষনের মাত্রা কিছুটা কম। তবে সেখান থেকেও নানা ধরনের রাসায়নিক খোলা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন্ এখানে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবজারের ফলে খুব সহজেই সেগুলো আশেপাশের পরিবেশ ও প্রানীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কারন এসব রাসায়নিক পানির মাধ্যমে ছড়ায় এবং সেই পানি প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে যায়। স্যুয়েজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্লাস্টিক গলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যা এক পর্যায়ে সাগড়ে গিয়ে পড়ে।
- বিভিন্ন বর্জ্যের পূনর্ব্যবহার: চামড়া, জুতা, প্লাস্টিক এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প কারখানায় প্রচুর পরিমানে সলিড বর্জ্য উৎপাদন হয় যেগুলোকে পরবর্তীতে পূনর্ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও পরিবেশের কথাটি বিবেচনায় রাখতে হবে। অপনিকল্পিত সংরক্ষণ, ব্যবহার, পরিজহনের কারনে মারাত্নক পরিবেশ বিপর্যও হতে পারে।
- আগুন সংক্রান্ত বিষয়: প্লাস্টিক কারখঅনা ও সংরক্ষণাগারগুলো আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ্য হওয়অর সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- যন্ত্রপাতি: বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির মেয়াদ শেষ হলে সেগুলো খুব সাবধানতার সাথে ব্যবস্থাপনা করা উচিত। কারন এসব পুরোনো যন্ত্রপাতি থেকে তেল চুইয়ে পড়তে পারে যেগুলো পরবর্তীতে ভূমি ও বায়ুতে সংমিশ্রিত হয়ে দূষণ সৃষি।ট করতে পারে।

ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব:

- বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের বিস্তার
- পূনর্ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা

প্রশমন পদক্ষেপ:

- প্রথম থেকেই যাতে গাছপালা না কাটা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রাকৃতিকভাবেই খোলা পরিবেশে যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। যদি গাছ কাটতেই হয় তাহলে অন্য স্থানে বৃক্ষ রোপন করতে হবে যাতে এই ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া যায়। কিভাবে এবং কী ধরনের বৃক্ষরোপন করা যাবে সেবিষয়ে স্থানীয় কর্মকর্তা পর্যায়ে আলোচনা করে নেয়া ভালো। স্থানীয়ভাবে যেসব চারা পাওয়া যায়

এবং যেসব গাছপালা ওই অঞ্চলে সধারনত হয়ে থাকে সেই ধরনের বৃক্ষরোপন করাই উচিত। প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের সময় পর্যাপ্ত এলাকা খাকা উচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য।

- সিএনসি মেশিন থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের বায়ু দূষণ মোকাবেলা ও স্বাস্থ্যহানী থেকে বাঁচতে হলে একটু খোলা পরিবেশে কাচ করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। ধূলো-বালি কমাতে পরিপূর্ণ ডাষ্ট পিউরিফিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আন্ডার ওয়াটার মেথডও ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে শব্দদূষণ কম হবে। যেসব স্থান থেকে রেডিয়েশন হতে পাওে সেখানে কাজ করার সময় পর্যাপ্ত পোশাক ও অন্যান্য সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে। যেখানে ঝালাইয়ের কাজ হবে সেখানে নিরাপত্তা চশমা, হেলমেট, মুখমন্ডল ঢেকে রাখার আবরণী ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া সার্বিভাবে প্রত্যেক কর্মীকে অবশ্যই অন্যান্য সতকর্তামূলক পোশাক, মাস্ক পরিধান করতে হবে।

  - **প্রকল্পের কারখানাগুলোর নির্গমন মাত্রা প্রাথমিক অবস্থাতেই পরিবেশগত মূল্যায়ন (ইএ) দ্বারা নির্দিষ্ট করতেত হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও অন্যান্য আচরণবিধি অনুসরণ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থা থেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর এ ধরনের স্যাম্পলিং করতে হবে। কারখানা পর্যায়ে প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের জন্য একজন নির্ধারিত কর্মকর্তা তাকবেন যিনি এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন। যেই পর্যায়ে একটি ধারাবাহিক ফলাফল আসতে শুরু করবে, তখন থেকে একটি মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসিআর ৯৭ অনুযায়ি প্রতিবছর কমপক্ষে দুই বার এই মানদন্ড মনিটর করতে হবে। যদি ইসিআর ৯৭ এর মানদন্ডের সমান কিংবা তারচেয়ে বেশি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।**
  - **সব ক্ষেত্রে পানির অপচয় রোধ করার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।**
  - **প্রত্যেকটি হালকা ও মাঝারি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানায় কাটিং ওয়েলের জন্য নির্ধারি স্থান থাকতে হবে। এখোনে প্রথম লক্ষ্য হবে পরিস্কার উৎপাদন নীতিমালা এবং উৎকৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। মেশিনের তেল তার স্বাভাবিক আয়ু শেষ করলে সেগুলো অপসারণ করে পূণর্ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।**

- সলিড বর্জ্য ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য সঠিকভাবে সঠিক স্থানে অপসারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পূনর্ব্যবহার, মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য ফেলার স্থান কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গুদামজাত করা যেতে পারে। ব্যাটারি, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, ওয়েদার বেলুন, সোলার প্যানেল, ট্রান্সডিউসার এবং কম্পিউটার থেকে ই-ওয়েষ্ট (বর্জ্য) উৎপন্ন হয় যাতে মার্কারি, লিড, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, জিংক লিথিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড, পটাশিয়াম হাইড্রো-অক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থাকে। এজন্য উত্তমরুপে এসব অপসারন করতে হবে এবং যন্ত্রপাতি মেয়াদোত্তীর্নের পর অপসারনের বিষয়গুলো অত্যন্ত ভালোভাবে দেখভাল করতে হবে। এসব রাসায়নিক পানি, বায়ু বা মাটিতে মিশে গেলে তা পরিবেশ, বন্যপ্রানী ও জনস্বাস্থ্যেও প্রতি মারাত্বক ক্ষতির কারন হতে পারে।

  - **থ্রি-আর পদ্ধতিতে (রিডিউস, রিসাইকেল ও রিইউজ অর্থাৎ ব্যবহার হ্রাস, পূনর্ব্যবহার ও পূনর্গঠন) সব ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করা উচিত। যেসব বস্তু পূনর্ব্যবহার সম্ভব সেগুলোকে প্রথম থেকেই পৃথক করা উচিত। এই সব কারাখানায় সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার রিসাইকেল করার মতো পদার্থ পরিবহনের ক্ষেত্রে যাচাই করতে হবে। যেসব স্থানে এগুলোকে রিসাইকেলের জন্য পাঠানো হবে সেসব কারখানা আইন অনুযায়ি চলছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।**
  - **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সব কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান কতে হবে।**
  - **সংরক্ষণসহ কারখানায় কী জিনিস কিভাবে থাকবে তার একটি ভালো ধরনা সবার মধ্যে থাকতে হবে। তাই এক্ষেত্রে একটি যথার্থ নিয়ম চালু করতে হবে। নির্মান কাজের সব ধরনের সামগ্রী একটি পরিস্কার, ও নিরাপদ স্থানে মজুদ করতে হবে। এছাড়া যেকোনো বস্তু রিসাইকেল বা ধ্বংস করার আগে একটি অস্থায়ি সংরক্ষণাহারের ব্যবস্থা করতে হবে।**
  - **খোলা মাঠে কোনো ভাবেই যন্ত্রপাতির মেরামতের কাজ করা যাবে না। গাছপালঅসহ অন্যান্য কোনো কিছুর যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য প্রিফ্যাব্রিকেশন আগে থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।**
  - **কর্মী ও কারাখঅনায় আগত সকলের নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্র বিশ্বব্যাংকের নির্মানশিল্পে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য শীর্ষক নির্দেশণা মেনে চলতে হবে। এছাড়াও ঠিকাদারের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে।**
  - **বিএনবিসি ২০১৫ এবং আইএলও (ওএইচএস) নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ি অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারখানা অভ্যন্তওে অবশ্যই অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অগ্নি সংক্রান্ত লাইসেন্স সংগ্রহ বাধ্যতামূলক। নিয়মিত মনিটরিং এবং কারখানা পরিদর্শন করতে হবে। এই ধরনের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টরা সম্পন্ন করবে।**
  - **যন্ত্রাপাতির মেয়দকাল পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে মেয়অদদ শেষ হলে দ্রুত সেটিকে ডিসপোজ করা যায়।**

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মপদ্ধতি

এই কর্মপদ্ধতিটি বাংলাদেশে সরকারের প্রচলিত আইন ও বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ি প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আসলে এই প্রকল্প থেকে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব নিরুপনের উদ্দেশে করা হয়নি বরং বাস্তবায়নের সময় প্রাকৃতিক পরিবেশের সর্বনিম্ন প্রভাব এড়ানোর লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মপদ্ধতি) তৈরি করা হয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে: ১. প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মূল্যায়ন; ২. প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব কী হতে পারে তার মূল্যায়ন; ৩. উপপ্রকল্পের জন্য প্রচলিত পরিবেশগত প্রশমন পদ্ধতি এবং মনিটরিং প্ল্যান সুপারিশ করা হয়েছে সম্ভাব্য ব্যয়সহ; ৪. পাবলিক কনসালটেশন; ৫. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা চিহ্নিতকরন এবং এসব ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ চিহ্নিতকরন; এবং ৬. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা।

নিচে উল্লেখিত মূল পদক্ষেপগুলো ব্যবহার করে এই রিপোর্টটিতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি অনুসরন করে কীভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক উদ্বেগ আমলে নিয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ণ করা হবে তা লীপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপগুলো হচ্ছে:

- স্ক্রিনিং এবং প্রভাব মূল্যায়ন
- কম্পোনেন্টের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার পর্যালোচনা, অনুমোদন ও প্রকাশ
- বাস্তবায়ন, রক্ষনাবেক্ষন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং

ইএমএফ এর সাধারণ নীতিমালা:

- সব ধরনের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পের পরিচালক দায়বদ্ধ থাকবেন।
- পিআইইউ ও প্রত্যেক ইআরএফ অনুদান গ্রহনকারী সরকারের সব ধরনের নীতিমালা ও বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা বাস্তবায়নে বাধিত থাকবে। এক্ষেত্রে ইএমএফ একটি মূল আচরণবিধি হিসেবে পরিগণিত হবে।
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা কম্পোনেন্ট ১.২, ২ ও ৩ এর সব ধরনের প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনহনের অংশগ্রহ নিশ্চিত করবে।
- প্রত্যেকটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশ বিভাগের ছাড়পত্র অর্জন করতে হবে। এবং ইএমপির বাস্তবায়নের ব্যবয় বিওকিউ-এর অংশ হতে হবে।
- স্থানীয় সরকার/সংস্থা ও কমিটির কাছ থেকে ছাড়পত্রের জন্য পিআইইউ দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।
- যেসব জমিতে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান সেখানে কোনোভাবেই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে না।
- প্রকল্পে ব্যবহৃত নেতিবাচক তালি ইএমএফ এ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনোভাবেই প্রকলেপর কোনো কাজ ুরু করা যাবে না।
- বিশ্বব্যাংকের সাথে প্রতি ৬ মাস পর একটি পরিবেশগত মনিটরিং প্রতিবেদন প্রদান করবে পিআইইউ।

সেফগার্ড স্ক্রিনিং ও প্রভাব মূল্যায়ন: প্রকল্পের কম্পোনেন্ট গঠন করার সময় মূল কাজগুলোর একটি হচ্ছে নিরাপত্তা ও প্রভাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ণ। সেফগার্ড স্ক্রিনিংয়ের ক্ষেত্রে দু'টি ধাপ রয়েছে - যোগ্যতা নিরুপন, সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়নে কারিগরি সক্ষমতা নিরুপন এবং এলক্ষ্যে কী ধরনের নীতি প্রনয়নের প্রয়োজন হতে পারে তা মূল্যায়ন। পরিবেশগত মূল্যায়নের মূল লক্যষ হচ্ছে এ থেকে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে যে প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে কী ধরনের পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। এই মূল্যায়ন পরবর্তীতে ইএ করার সময় ব্যবহৃত হবে।
আগেই বলা হয়েছে যে সব ধরনের নিরীক্ষণ প্রকল্পটি অবশ্যই পরিবেশের উপরে নেতিবাচক প্রভঅব কমিয়ে আনাসহ অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে আসা উচিত, তা হচ্ছে বাইরের বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে নিজস্ব একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিক করা যায়। তারপরেও নির্মান কাজের কারনে কিছু না কিছু নেতিবাচক প্রভঅব পড়তে পারে যেমন আইসিটি সিস্টেম, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, অন্যান্য যন্ত্রপাতি। এসব সামগ্রীর অপরিকল্পিত ব্যবহার হলে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে নিয়ে আসতে পারে। কারিগরি নিরীক্ষণের মাধ্যমে এই উপ-প্রকল্পগুলোকে ওপি ৪.০১ অনুযায়ি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে ইসিআর ৯৭ অনুযায়ি প্রকল্প/উপ-প্রকল্পকে শ্রেনীকরন করা যেতে পারে। পিআইইউ সরাকরের বিভিন্ন পর্যায় থেকে এ সংক্রান্ত ছাড়পত্র সংগ্রহ করবে।

এই প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও কার্যক্রম নিরীক্ষণ করতে একটি চেকলিষ্ট ব্যবহার করা হবে। এটি মূলত বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, এফজিডি এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে কেআইআই এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাঠকর্মী স্থানীয় জনগনের সাথে আলাপ করেই এই তৈরি করা হবে। এই চেকলিষ্টটি

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা অনুযায়ি নিরাপত্তা বিষয়ে যে মাত্রা পরামর্শ দেয়অ হয়েছে তা অনুযায়ি হতে হবে, যেমন - প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনাঞ্চলে প্রতি ঝুঁকি, বায়ু, ভূমি, ও পানি দূষণের ঝুঁকি, জনস্বাস্থ্য, ভূমিক্ষয়সহ কোনো ঐতিহ্যবাহী দালান-স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা নিরুপন করা। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব নিরুপন করা হবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে (কম্পোনেন্ট ১ এবং কম্পোনেন্ট ২ ও ৩ এর ইএস প্রতিবেদন অনুদানের জন্য আবেদন এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের সময় দাখিল করতে হবে)।

পরিবেশের উপরে প্রভাবের ধরণ ও মাত্রা বিবেচনা করে উপ-প্রকল্পগুলোকে তিনটি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে।

যেসব উপ-প্রকল্পের কারনে পরিবেশের উপরে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব প্রড়তে পাওে যেগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অজ্ঞাতনামা - অথবা এমন একটি স্থানে সেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যেটি পরিবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান - যেমন্ জলাভূমি বা হাওড়, বন, তৃনভূমি এবং অন্যান্য। এছাড়া এমন প্রকল্পসমূহ যেটি জনস্বাস্থ্যেও জন্য হানীকর	অযোগ্য
প্রকল্পসমূহ যেগুলোর কারনে পরিবেশের উপরে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে। এগুলো কিছুটা ক্ষতিকর হলেও প্রশমন ব্যবস্থা রয়েছে। এর কারনে জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হয় না।	যোগ্য
এমন প্রকল্পসমূহ যা থেকে পরিবেশেন উপওে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুব কম বা নেই। এগুলো এন প্রকল্প যেখানে আসলে বড় ধরনের যন্ত্রপাতি/মেশিন স্থাপনা নেই।	যোগ্য

নিচে উল্লেখিত উপ-প্রকল্পগুলো বিশ্বব্যাংকের অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবে না

- কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য মারাত্বক হানীকারক উপ-প্রকল্প
- যেসব উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ধরনের ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি থাকতে পাওে যেখান থেকে পরিবেশের ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে।
- চামড়া শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন উপ-প্রকল্প যেগুলো শিল্প এলাকার মানদন্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এবং সিইটিপি'র সাথে সংযুক্ত নয়।
- যেসব প্রকল্প বিশ্বব্যায়কের আইএফসি'র তালিকাভুক্ত নয়।
- রেড - এ তালিকায় থাকা ট্যানারি, প্লাস্টিক কারখানা। যদি প্রযক্তি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যা কিছু আছে পরিহার করা যায় কেবল তখনই এসব শিল্প অনুদানের যোগ্য হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শ্রমদক্ষতা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)

একটি প্রকল্পের ইএমপি (EMP) গড়ে ওঠে প্রশমন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের উপরে যেগুলো বাস্তবায়ন ও পরিচালনের সময় ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে পরিবেশ এবং ভূমির উপরে বিরুপ প্রতিকূলতা কমিয়ে আনা যায় বা এ সম্পর্কে যথেষ্ট গ্রহনযোগ্য পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রহনযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা যায়। এছাড়াও এই পরিকল্পনার মাধ্যমে এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নেরও প্রচেষ্টা করতে হবে। 'ক' শ্রেনীভূক্ত প্রকল্পের EIA প্রতিবেদনের জন্য EMP একটি অপরিহার্য অঙ্গ: অবশ্য অনেক 'খ' শ্রেনীভূক্ত প্রকল্পের জন্য EA কেবল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই থাকে। কেবলমাত্র পরিবেশগত ঝুঁকিপূর্ন এলাকায় সরঞ্জাম স্থাপন বা নির্মান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে EMP প্রয়োজন হয়। EMP প্রস্তুত করার সময় পরিবেশগত ঝুঁকিপূর্ন এলাকার সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন থাকতে হবে এবং সব ধরনের প্রশমন পদক্ষেপ সম্ভাব্য প্রভাবের ধরন অনুযায়ি হতে হবে। একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের সময় পিআইইউ'কে সম্ভাব্য প্রভাবের প্রতি কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় তা চিহ্নিত করতে হবে; খ) নিশ্চিত করতে হবে যেন এসব পদক্ষেপ/ব্যবস্থা যাতে কার্যকর ও যথাসময় কার্যকর করা যায়; এবং গ) এসব প্রয়োজনীয়তা/ব্যবস্থা গ্রহন করতে যেসব পদক্ষেপ দরকার তার বর্ননা।

বিকল্প ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষন

স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল পরিবেশে কাজ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু বিকল্প পরিকল্পনা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। এ ধরনের বিকল্পগুলো পদক্ষেপ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিচে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

- **ঝুঁকিপূর্ন বা পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ণ করা বা না করার বিষয়ে;**
- **মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত/নকশাগত এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে আমলে নেয়া (ছক ৬.২);**

- **নেটওয়ার্ক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোত্তম স্থানকে বিবেচনা করতে হবে; ডেটা ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উজান ও ভাটি এলাকাকে নির্বাচন করা উচিত যেগুলো পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকার বাইরে রয়েছে এবং সেসব তথ্য মডেলিং এবং স্যাটেলাইট প্রাপ্ত তত্যেও সাথে সমন্বিত হতে হবে।**

এনভায়রমেন্ট কোড অব প্র্যাকটিস (ECoP / ইসিওপিএস)
এনভায়রমেন্ট কোড অব প্র্যাকটিস (ইসিওপিএস) বা পরিবেশগত আচরনবিধি মূলত একটি সর্বক্ষেত্রেই একই ধরনের, এটি বিশেষ কোন স্থানের জন্য নির্ধারিত নয়। এই প্রকল্পের জন্য নিম্নোক্ত ইসিওপিএস বা আচরণবিধি মেনে চলতে হবে:

- বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত আচরনবিধি
- দূষন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আচরনবিধি
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আচরনবিধি
- নির্মান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আচরনবিধি
- অগ্নি নির্বাপন সংক্রান্ত আচরণ বিধি
- পূনর্ব্যবহার সংক্রান্ত আচরণবিধি
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আচরনবিধি
- নির্গমন সংক্রান্ত আচরণ বিধি
- অ্যাসিড ও রাসায়নিক সংক্রান্ত আচরণবিধি

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন:
যেসব স্থানে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন হয়েছে তা হচ্ছে ক) গাজিপুর ও ঢাকায় কারাখানা পর্যায়ে খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কিছু কারাখানায় বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে, হৈ কনসালটেশনগুলো বেশ কয়েকটি পর্যায়ে হয়েছে যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৬ জানুয়ায়ি ২০১৭ সালে। এই কনসালটেশনের উদ্দেশ্য ছিল - স্টেকহোল্লারদের কাছে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা, বিভিন্ ধরনের মূল্যায়নের ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহন এবং বিভিন্ন নিরীক্ষন তালিকা ও সংশ্লিষ্ট প্রভাব নিরুপনে তাদেও মতামত গ্রহন করা। খসড়া ইএমপি নিয়ে কনসালটেশনে বিস্তর আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের মুক্ত আলোচনা ও উপস্থাপনা করা হয়। এসময় প্রস্তাবিত ইএমপি ও ইসিওপিএসসহ এই প্রতিবেদনের খসড়া তুলে ধরা হয়। এসময় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের স্বার্থে তাদের সঙ্গে বিস্কারিত আলোচনা হয়। প্রথম দিকের আলোচনায় ১৫ জন অংশ নেয় এবং পওে ফেব্রুয়ারির কনসালটেশনে ২৮ জন রেজিস্ট্রেশন করে। এসময তারা সবাই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা এসময় ইএমএফ সম্পর্কে প্রশিক্ষনের অনুরোধ জানায়। আলোচনায় অংশগ্রহনকারীরা রেড ক্যাটাগরি ও ইসিআর ৯৭ নিয়ে আলোজনা করেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে সবাই এই প্রতিবেদনটির পরামর্শকে সমর্থন করেন।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) - এর সঙ্গে একটি বৈঠক অুনষ্ঠিত হয়। যেহেতু এই প্রকল্পটির বিভিন্ন কার্যক্রম বিভিন্ন শিল্প এলাকায় বাস্তবায়িত হবে তাই এর সঙ্গে জড়িতদের সক্ষমতার বৃদ্ধিরর উপওে জোর দেন, যাতে করে পরিবেশগত প্রভাবের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে একটি নিরবিচ্ছিন্ন ধারণা তৈরি করা যায়। তিনি এই প্রকল্পটিকে সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ বলে মনে করেন। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিও জন্য কোনো পরিবেশ ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই। তবে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইসিআর ৯৭ এর শ্রেনী নিরুপন করতে হে পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রয়োজন। তিনি মনে করেন ইএমএফ এর মাধ্যমে প্রত্যেক কারখানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থান নিশ্চিত করা উচিত যাতে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব ও সামাজিক উদ্বেগগুলো নিরুপন করা যায়।

সেফগার্ড সংক্রান্ত ঘোষনা:
এই প্রকল্পে ব্যবহৃত সব ধরনের যন্ত্রপাতি, কর্মকান্ড ও স্থাপনা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করতে হবে। আর এই কাজটি করতে হবে কম্পোনেন্টগুলোর অনুমোদনের আগেই। এসব ঘোষনা এমন স্থান ও ভাষায় প্রচার করতে হবে যাতে প্রকল্পের সব স্টেকহোল্ডাররা তা সহজেই বুঝতে পারে। এই তথ্য প্রকাশের সময় যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে:

- প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড ও ফলাফল
- কোনো ধরনের পরিবেশগত প্রভাব (ইতিবাচক ও নেতিবাচক)
- যেসব প্রশমন ব্যবস্থা নিতে হবে
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মপদ্ধতি

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাঃ

এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (ইএমএফ) বাস্তবায়নে প্রয়োজন একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, প্রশিক্ষন পরিকল্পনা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার দায়িত্ব পালন করবে এবং এটি সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ১. প্রকল্প পরিচালনা ও নীতিগত নির্দেশনা, ২. প্রকল্প সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা এবং ৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন।

উপরের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) এ একজন পরিচালক, কারিগরি কর্মী, ক্রয় সংক্রান্ত কর্মকর্তা, অর্থ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, পরিবেশবিদ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং একজন মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন কর্মকর্তা নিযুক্ত থাতবে। চারটি কারখানা পয়েন্টে পিআইইউ চারজন ব্যবক্তির উপরে নির্ভর করবেন সমন্বয়ের লক্ষ্যে। এলক্যেষ একটি আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে একটি কোম্পানীকে নিয়োগ করা হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে পিআইইউ ইআরএফ ম্যানেজার (কম্প ১.২) সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদেও সঙ্গে বসে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন। প্রতি বছরে পিআইইউ ২ বার পিএসসিকে প্রতিবেদন দাখিল করবে। পিআইইউ মূলত দুটি উপদেষ্টা কমিটির উপরে নির্ভও করবে - ইআরএফ ও কারিগর কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়া। প্রথমটিতে সরকার, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকবে আর অন্যটিতে থাকবে কারখানা/শিল্প ও বেসরকারী সেক্টর। পাশাপাশি পিআইইউ'র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ছাড়াও নিয়োগকৃত ফার্মটি পরিবেশ বিষয়ক মনিটরিং করবে এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করবে যাতে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব আরো কমিয়ে আনা যায়।

অসন্তোষ প্রতিকার:

অসন্তোষ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বে, সমস্যা যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে আসতে পারে। এই প্রকল্পটিকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে এবং এ নিয়ে কাজও করতে হতে পারে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্থানীয় ও প্রচলিত প্রক্রিয়া মেনে চলতে হতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রকল্প পর্যায়ে এইট অত্যন্ত ভালোভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। এটি দাঁতা সংস্থার প্রস্তাবিত দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কেত নয় বরং এটি স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানের জন্য যা প্রয়োজন সে ধরনেরই একই নীতিমালা। বাস্তব অবসআয় যদি এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্স্থানীয় প্রকল্প পর্যায়ে আসতে হবে। কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দিতে হলে জিআরসি ব্যবস্থাপনা অনুযায়ি দিতে হবে। অসন্তুষ্ট ব্যক্তি প্রকল্পের যে কোনো পর্যায়ে সঠিক সমাধান চাইতে পারেন। তবে সন্তুষ্ট না হলে তিনি বা তারা আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহন করতে পারেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা:

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কৌশলের কার্যকারিতা নির্ভর করবে এ বিষয়ে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ টদের সক্ষমতা ও ধারণা কতটুকু আছে তার উপরে। তাই প্রকল্পের উচতি কর্মীদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষন প্রদান করা।

এক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত ঃ

- পরিবেশগত অবক্ষয় সংক্রান্ত নীতি
- আইনগত বিষয়, প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি
- প্রকল্প দ্বারা সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব
    - **এক্ষেত্রে নিম্লোক্ত বিষয়সমূহ অগ্রাধীকার দিতে হবে:**
    - **প্রশিক্ষণ পরবর্তী লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারের সুযোগ। কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত ফলো-আপ।**
    - **একটি কর্মকর্তা গ্রুপ তৈরি করা যারা এক্ষেত্রে সক্ষম, প্রতিশ্রুতবদ্ধ এবং অভিযোজনে সক্ষম। এমন ব্যক্তিদেও নির্বাচিত করা এবং তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান**
    - **প্রশিক্ষণ সুবিধার বিকেন্দ্রীকরণ যার ফলে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে এই সংক্রান্ত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়।**
    - **প্রশিক্ষণে ব্যস্ত কর্মীকে উৎসাহ প্রদান যাতে তিনি এই কাজে উৎসাহ বোধ করেন।**
    - **মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দিতে হবে প্রশিক্ষণের জন্য**
    - **যেখানে সম্ভব সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন, অন্যান্য প্রশিক্ষণের সময়ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নকে সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টা নেয়া**
    -
    - **পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং ব্যয়**
    - **বেশিরভাগ প্রশমন পদক্ষেপ বিশেষ করে নির্মান কার্যক্রম ব্যবস্তাপনা ইপ-প্রকল্পগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য উপ-প্রকল্পের মূল বাজেটের সঙ্গে এই কার্যক্রমের বাজেট সংযুক্ত থাকবে যেটি প্রনয়ন করবে পিআইইউ। এছাড়াও ইএমএফ বাস্তবায়নের অতিরিক্ত ব্যয়েল খাতগুলো হচ্ছে: পিআইইউর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; কমপ্ণায়েন্স মনিটরিং কর্মকর্তা এবং পরিবেশগত অডিট।**

- এজন্য সার্বিক বাজেটের পরিমান ২২৫,০০০ মার্কিন ডলার যা এই ইএমএফ প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিবরণ সহ রয়েছে।
-
- উপসংহার ও সুপারিশ
-
- এই ইএমএফ প্রতিবেদন পরিবেশগত নিরাপত্তা নির্দেশনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু এবং তা প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প পর্যায়ে কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সপারিশ প্রদান করে থাকে। যদিও ইসিফরজে প্রকল্পে ঠিক দেমন কোনো নির্মান কার্যক্রম নেই। তারপরেও কিছু অনুদান নির্ভর উপ-প্রকল্পে যন্ত্রপাতি স্থাপন, উন্নয়ন ও উৎপাদনের লক্ষ্যে এটি প্রদিবেদন কাজে আসবে।
-
- কিছু কিছু সরঞ্জাম যেমন পরিবেশ মনিটরিং সরঞ্জাম, আইসিটি, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, কারিগরি যন্ত্রপাতি এই প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে। জুতা তৈরির কারখানা, চামড়াজাত পণ্য, প্লাষ্টিক, রাবার পণ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি, শিল্প যন্ত্রপাতি অরেঞ্জ এ শ্রেনীভূক্ত। এক্সপোর্ট রেডিনেস ফান্ড থেকে এই প্রকল্পগুলোকে অর্থায়ন করা হবে যার মধ্যে সেবা ও সম্পত্তি ব্যয়ে অর্থায়ন করা হতে পারে সর্বোচ্চ ২০০,০০ মার্কিন ডলার। এই কার্যক্রম ইসিআর ৯৭ অনুযায়ি রেড তালিকাভূক্ত।
-
- কম্পোন্টে ২ ও কম্পোনেন্ট ৩ এর জন্য কারিগরি উন্নয়ন কেন্দ্র/সিএফসি এবং এর সাথে সংযুক্ত সড়ক নির্মান করতে হবে।
- ইসিআর ৯৭ অনুযায়ি শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পে বায়ুর গুনাগুন, শব্দ, ও বর্জ্যেও মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যে কোনো বিশেষ পরিবেশগত পর্যায়ে এই মাত্রা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
-
- এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একটি ‘বি’ তালিকাভূক্ত প্রকল্প। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ মূল্যায়ন নীতিমালা (ওপি/বিপি ৪.০১) দ্বারা সুপারিশকৃত। সাধারনভাবে বরা যায় এই প্রকল্প থেকে উল্লেখ করার মতো কোনো নেতিবাচক প্রভাব পরিবেশের উপওে পড়বে না। তবে কিছু নির্মান ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হতে পারে।
-
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পিআইইউ কোনো ধরনের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়াই কাজ শুরু করেছে। তাই এক্ষেত্রে পিআইইউ’র সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে পরিবেশগত নানা ধরনের প্রভাব মূল্যায়ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। কমপক্ষে একজন পরিবেশগত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ পূর্ণাঙ্গ সময়ের জন্য যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগ করতে হবে।
-
- পরিবেশ বিশষজ্ঞ পিআইইউ’তে স্থায়ি হবেন এবং পরিবেশগত সার্বিক বিষয়ে তিনি পিআইইউকে পরামর্শ, সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- এই ইএমএফ’টি বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত করেছে এবং একইসাথে এ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করেছে। এটি বাঞ্ছনীয় যে প্রকল্পের সব ক্ষেত্রে যেখানে প্রযোজ্য হবে, যেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি ক্ষেত্রসমূহে এই ইএমএফ-এর নির্দেশনা ও পরামর্শ আমলে নেয়া উচিত।
-

পরিশিষ্ট ২

আচরণবিধি ১: বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত আচরণবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
গাছপালা/বৃক্ষ উজাড়	স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতি পাখির আবাসস্থালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এরা ফল ও কাঠ/জ্বালানী কাঠ প্রদান করে, ভূমিক্ষয় থেকে সুরক্ষা দেয় এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। এ ধরনের উদ্ভিদকূল ক্ষতিগ্রস্থ্য হলে তা পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন: ● চারপাশের উদ্ভিদকূলকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে কাজ করতে হবে; ● উদ্ভিদকূল/বৃক্ষ নিধনে সংশ্লিষ্ট পরামর্শকের কাছ থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে; ● যেসব স্থানে গাছপালা/উদ্ভিদ কেটে ফেলতে হবে সেসব স্থান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করতে হবে; ● নির্দিষ্ট স্থানে পুড়িয়ে বা জমা করার সময় অস্বাস্থ্যকর/ক্ষতিকর আগাছা নিয়ন্ত্রন করতে হবে; ● প্রকৌশলী পরিকল্পনা এবং নকশা অনুযায়ী যতটুকু এলাকাজুড়ে গাছপালা কাটা প্রয়োজন তার অধিক না কাটা। এই ধরনের ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে যেকোন ধরনের নির্মান স্থল ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে (স্টক পাইলস, আর্বজনা ফেলার স্থান); ● বৃক্ষ নিধন এবং বৃক্ষ রোপনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে; ● খনন কাজ ক্রমান্বয়ে এবং বৃক্ষ রোপন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে করতে হবে। ● কর্মীদেরকে প্রকৃতি সংরক্ষনে সম্যক ধারণা এবং নির্মান কাজের সময় যতটুকু সম্ভব বৃক্ষ নিধন এড়িয়ে চলার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হবে; ● উদ্ভিদসহ অন্যান্য প্রজাতির জেনেটিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে হবে। বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে মনোকালচার হ্রাস এবং বিদেশী প্রজাতি রোপন এড়িয়ে চলতে হবে। যতটুকু সম্ভব স্থানীয় প্রজাতি রোপন করতে হবে; ● উদ্ভিদ ও চারা রোপনের ক্ষেত্রে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (WMO) নির্দেশনা মেনে চলতে হবে; ● যেহেতু বৃক্ষরোপন কর্মসূচী বছর জুড়ে চলবে না, তাই যতটুকু সম্ভব চারা বা বীজ বন বিভাগের নার্সারী অথবা ব্যক্তিগত নার্সারী থেকে সংগ্রহ করা উচিত। ধারনা করা হয় যে, বন বিভাগের চারা বা বীজ উন্নত মানের হয়। ভালো ফলাফল পেতে দেড় বছর বয়স্ক ২৫ সে.মি. x ১৫ সে.মি. পলি ব্যাগে এক মিটার লম্বা চারা ব্যবহার করা উচিত। পরিবহনের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, মাথায় বহন বা নৌকায় পরিবহন করা।

আচরণবিধি ২: দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আচরণবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
ঝুঁকিপূর্ন বস্তু ও বর্জ্য	সংরক্ষনাগার থেকে পানি দুষণ, ঝুঁকিপূর্ন বস্তু ব্যবহার এবং ধ্বংসকরণ এবং সাধারণ নির্মান সংশ্লিষ্ট বর্জ্য নিঃসরণসৃষ্ট দূর্ঘটনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন: ● প্রস্তাবিত ECP 3: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ ● জঞ্জাল, তেল ও গ্রিজ, অতিরিক্ত পুষ্টি, অর্গানিক বস্তু, জঞ্জাল, আবর্জনা এবং যে কোন ধরনের বর্জ্য (বিশেষ করে পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক বর্জ্য)-এর বিস্তার হ্রাস করতে হবে। এ ধরনের পদার্থ কোনভাবেই যেন প্রবাহমান পানিতে প্রবেশ করতে না পারে।
নির্মানস্থল থেকে নির্গমন	নির্মান কর্মকান্ড, নির্মান স্থলের পয়:নিষ্কাশন এবং নির্মানস্থানে স্থাপিত ক্যাম্প এর উপরে ভূ-উপরিস্থিত পানির মান থেকে প্রভাব পড়তে পারে। নির্মান স্থলে ভূ উপরিস্থিত পানি নি:স্কাশনের ধরনের কারনে ঐ স্থানে ভূ-সংস্থান পরিবর্তন হতে পারে।	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন: ● প্রবাহমান পানিতে সব ধরনের কঠিন ও তরল বর্জ্য প্রবেশ প্রতিরোধ করবেন আবর্জনা, তেল, রাসায়নিক, আলকাতরা মিশ্রিত বর্জ্য এবং ইট থেকে সৃষ্ট দূষিত পানি এবং বিভিন্ন এসফল্ট কাটিং সংগ্রহের মাধ্যমে। এই সমস্ত বর্জ্য অনুমোদিত বর্জ্য ফেলার স্থান বা রিসাইক্লিং ডিপোতে পাঠাতে হবে।
খাবার পানি	অপরিশোধিত ভূ-পরিস্থিত পানি পানের যোগ্য নয় কারন তার মধ্যে নানা ধরনের পদার্থ থাকতে পারে।	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন ● জাতীয় ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মান এর সাথে সঙ্গতি রেখে সুপেয় পানি সরবরাহ করতে হবে।

আচরনবিধি ৩: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আচরনবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
সাধারণ বর্জ্য	অনুপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নির্মানস্থলে অতিরিক্ত সামগ্রীর কারনে সৃষ্ট ভূমি ও পানি দূষন	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - ● যেন নির্মান কাজের সময় সৃষ্ট বর্জ্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত এলাকায় ফেলা হয় এবং যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয় (যেমন- পূনর্ব্যবহারের যোগ্য বর্জ্য, দাহ্য বর্জ্য নির্মানসংশ্লিষ্ট বর্জ্য)। এ ধরনের স্থান র্নিবাচন নির্মান কাজ শুরুর আগেই সম্পন্ন করতে হবে। ● বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশবান্ধব উপায় অনুসরণ করতে হবে। ● 3-R

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
		পদ্ধতি অনুসরন করে বর্জ্য উৎপাদনহ্রাস করতে হবে। • যেসব গাড়িতে বর্জ্য পরিবহন করা হবে সেসব গাড়ি পুরোপুরি আচ্ছাদিত থাকবে যাতে সেখান থেকে কোনো ধরনের নি:সরণ না হয়। • যতটুকু সম্ভব বর্জ্য পৃথক করতে হবে। • গাড়িতে যে আচ্ছাদন ব্যবহার করা হবে তা যে কোনো ক্ষয়ক্ষতিমুক্ত হতে হবে (দেখতে হবে যাতে কোথাও কোনো ছেঁড়া না থাকে)। এই আচ্ছাদন পুরোপুরি নিরাপদভাবে গাড়ির সাথে সংযুক্ত হতে হবে। আচ্ছাদন যে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবে তার শেষ প্রান্ত কমপক্ষে ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ হতে হবে। সব ধরনের বর্জ্য যেখান থেকে সৃষ্টি হবে সেখান থেকেই আচ্ছাদন করে নির্দিষ্ট ধ্বংস করার স্থানে নিয়ে যেতে হবে। পরিবেশগত অভিষেকের অংশ হিসেবে প্রত্যেক কর্মীকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। • প্রত্যেক ওয়ার্কস্টেশনে শূন্য কন্টেইনার প্রদান করতে হবে। • সরাবরাহকারীকে যতটুকু সম্ভব প্যাকেজিং কমিয়ে আনার বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। • সঠিক গৃহ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অত্যধিক জোর দিতে হবে। • সকল নির্মানস্থল পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখতে হবে এবং চূড়ান্তভাবে বর্জ্য ধ্বংস করার আগ পর্যন্ত সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। • বিপজ্জনক নয় এমন বর্জ্য সংগ্রহ করে বিএমডি ও বিডব্লিউডিবি কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।
জ্বালানী ও বিপজ্জনক সরঞ্জাম	নির্মানকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম থেকে দূষন হতে পারে। অপরিকল্পিত সংরক্ষন, জ্বালানী, লুব্রিকেন্ট, রাসায়নিক, বিপজ্জনক সরঞ্জাম/পদার্থ, উদ্ভিদ নিধন ও বিভিন্ন ধরনের নি:সরনের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতিসহ কর্মীদের স্বাস্থ্যহানী হতে পারে।	পিআইইউ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন- • রাসায়নিক বর্জ্য ২০০ লিটার ড্রামে সংগ্রহ করে সঠিকভাবে লেবেল লাগিয়ে অনুমোদিত রাসায়নিক বর্জ্য ধ্বংসের স্থানে পাঠাতে হবে। • পরিবেশ দূষণ এড়িয়ে সব ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও পরিবহন এবং ব্যবহার করতে হবে। • সব ধরনের বিপজ্জনক বর্জ্য প্রবাহমান পানির উৎস থেকে দুরে একটু উঁচু স্থানে সংরক্ষন করতে হবে। • নির্মান কাজের সময় সাইটে ব্যবহৃত সব ধরনের বিপজ্জনক সরঞ্জামের জন্য তালিকা তৈরী করতে হবে (Material Safety Data Sheets -MSDS) • সব ধরনের বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বা সরঞ্জাম প্লাবন ভূমির থেকে উঁচু স্থানে রাখতে হবে। • পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত এলাকায় অস্থায়ী সংরক্ষণাগার তৈরী করে কন্টেইনার ও ড্রাম রাখতে হবে যাতে কোন যানবাহন বা ভারী যন্ত্রপাতী

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
		দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ্য না হয়। এ স্থানটি একটু ঢালু হলে ভাল হয় অথবা তেল নিঃসরনের সময় যেন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা থাকে। ● যেসব সরঞ্জাম থেকে দূষণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবেশ দূষণ করতে পাওে সেগুলোর ব্যবহার কমিয়ে যথাসম্ভব পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।
বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম খোলা ও ধ্বংস	বর্জ্য ও অতিরিক্ত সরঞ্জামের অপ্রকৃত ব্যবস্থাপনার কারনে ভূমি ও পানি দূষণ হতে পারে	এক্ষেত্রে পিআইইউকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ● কেবল প্রশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারাই সব ধরনের সরঞ্জাম খোলা ও ধ্বংসের কাজ করতে হবে। ● পরিবেশ দূষণ এড়াতে সব ধরনের সরঞ্জাম অত্যন্ত সতকর্তার সাথে গুদামজাত, পরিবহন ও ব্যবহার করতে হবে। ● যতটা সম্ভব বিভিন্ন সরঞ্জাম পূনর্ব্যবহার করতে হবে। ● বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ি সব ধরনের সরঞ্জাম ধ্বংসের কাজ করতে হবে।

আচরনবিধি ৪: নির্মান ব্যবস্থাপনা আচরনবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
নির্মান কার্যক্রম ও সরঞ্জামের মজুদ	ভূমি ক্ষয়ের প্রভাবগুলো হচ্ছে: ক) বর্ধিত পানি ও পলির প্রবাহ ভাটি অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা তৈরি করে, খ) ভূমিক্ষয় ও পলির স্তরের কারনে জলজ জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে মাছের প্রজনন এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ্য হয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - ● নির্মান ক্যাম্প বাস্তবায়নে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ এই অনুমোদন সংগ্রহ; ● উদ্ভিদের মূলের কাছাকাছি যে কোনো ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে গাছের গোড়ায় কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হয়; উদ্ভিদকূল নিধন বা বৃক্ষরোপানের পর যত দ্রুত সম্ভব খোলা বা গর্ত করা জমির মুখ বন্ধ করতে হবে। ● খনন কাজ ক্রমান্বয়ে এবং পুনরায় বৃক্ষ রোপনের কাজ দ্রুততার সাথে করতে হবে; ● যতটুকু সম্ভব আগে থেকেই সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য সবকিছু প্রস্তুত কওে রাখতে হবে যাতে মাঠকে খুব বেশি ক্ষতির শিকার না হতে হয়; ● উত্তম গৃহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জোর দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যেন নির্মানস্থলকে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখা হয়। অস্থায়ি ভিত্তিতে বর্জ্য ফেলার স্থান নির্ধারন করতে হবে স্থায়িভাবে সেসব বর্জ্য ধ্বংস করার পূর্ব পর্যন্ত; কংক্রিট মিক্স এজিটেটরসহ (কংক্রিট মিশ্রন তৈরির জন্য একধরনের যন্ত্র) অন্যান্য কংক্রিট সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম পরিচ্ছন্ন রাখার স্থান সাইট থেকে একটু দুরে রাখতে হবে, অথবা নির্মানস্থলেই কোনো অনুমোদিত স্থানে করতে হবে; নির্মানকাজে ব্যবহৃত গাড়ির চাকা পরিস্কার রাখতে হবে। প্রত্যেকবার বাইরে যাওয়ার আগে গাড়ির চাকা পরিস্কার করতে হবে যাতে

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
		স্থানীয় রাস্তাঘাট পরিস্কার রাখা যায়। নিষ্কাশন লাইনের আশেপাশে কোনো সামগ্রী মজুদ থাকলে তা চিহ্নিত করতে হবে; • সব ধরনের আবর্জনা নিষ্কাশন লাইন ও পলি নিংন্ত্রন স্থাপনার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে; • কনস্ট্রাকশন কাজের খোলা পলি ও পানি ঢেকে রাখতে হবে; কোনো প্রবাহমান জলধারা থাকলে তার প্রবাহ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে নির্মানস্থলে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না করতে পারে; কনস্ট্রাকশনের আগেই সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে, যেমন - সেডিমেন্ট ট্র্যাপ; উচু/ঢালু এলাকায় নির্মানকাজ করার সময় দ্রুত প্রবাহমান পানির গতিতে যাতে কোনো ধরনের ভূমিক্ষয় না হয় সেজন্য ড্রেইন নিমান করতে হবে; • বৃষ্টির সময় এসব ড্রেনের দিকে নজর রাখতে হবে যে ঠিকমতো কাজ করছে কি না। কাজ না করলে নকশায় পরিবর্তন আনতে হবে;
নির্মানস্থল পরিস্কারকরন	পরিস্কার এরা এলাকা ও বিভিন্ন ধরনের ঢাল উদ্ভিদের গড়ে ওঠার জন্য যে কর্ষনীয় জমি তার ক্ষতির কারন হয় এবং এ সংক্রান্ত পরিবেশগত অসাম্য তৈরী করে	ত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - • **গাছপালা কেটে পরিস্কার করা স্থানগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব পূনর্বহাল ও নিরাপদ করে গড়ে তুলতে হবে।** • **খোলা স্থানগুলো যত দ্রুত সম্ভব বৃক্ষরোপন/ঘাস লাগানোর মাধ্যমে ঢেকে ফেলতে হবে;**
ভূমি ক্ষয় ও পলি	ভূমিক্ষয় ও সরঞ্জাম মজুদ থেকে ধূলোবালি সৃষ্টি হবে যা ভূউপরিভাগের পানির উৎসগুলোকে দূষিত করতে পারে	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - • **যেসব স্থানে গাছপালা কেটে পরিস্থার করা হয়েছে সেসব স্থান বৃক্ষরোপন বা যথাযথ পানি বিশুদ্ধিকরনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব ভূমি ক্ষয় রোধ করতে হবে; ধূলো-বালি হ্রাসে সরঞ্জামের মজুদ, অ্যাক্সেস সড়ক, খোলা স্থানে পানি ছিটাতে হবে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে। ঝুঁকি কালীন সময়ে (যেমন- প্রবল বাতাস) পানি ছিটানোর মাত্রা বাড়াতে হবে।**

আচরনবিধি ৫: স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আচরনবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ	কর্মী ও সরঞ্জাম ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কংক্রিট পিলার ও সেতুর উপরে অনেক ধরনের যন্ত্রাপাতি স্থাপন করা হবে। যন্ত্রপাতি স্থাপন ও বয়া পরিদর্শনের সময় এ ধরনের সাইটে আসা-যাওয়া অনিরাপদ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - • **সব ধরনের কর্মী এবং সাইট পরিদর্শনে আসা ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এসব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে হবে (International Labor Office guideline on ‘Safety and Health in Construction; World Bank Group’s ‘Environmental Health and Safety Guidelines’ I World Bank Group’s**

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
	হতে পারে	**‘Environmental Health and Safety Guidelines’**)। পাশাপাশি ঠিকাদারের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকতে হবে। • সব কর্মীদের একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ প্রদান করতে হবে। নির্মানস্থলে যে কোনো ধরনের ঝুঁকি এড়াতে এসব কাজ করতে হবে। • কারখানা পর্যায়ে একটি নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী থাকতে হবে। • সকলে যাতে দেখতে পারে এমন স্থানে জরুরী টেলিফোন নম্বরসমূহ প্রদর্শণ করতে হবে। • যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদেরই নিযুক্ত করতে হবে।

আচরনবিধি ৬: অগ্নি নির্বাপন সংক্রান্ত আচরনবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
অগ্নি নির্বাপন নিরাপত্তা	আগুনসষ্ট দূর্ঘটনা ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - • বিএনবিসি ২০১৫ এবং আইএলও (ওএইচএস) নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ি অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। • কারখানা অভ্যন্তওে অবশ্যই অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা থাকতে হবে। • সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অগ্নি সংক্রান্ত লাইসেন্স সংগ্রহ বাধ্যতামূলক। • নিয়মিত মনিটরিং এবং কারখানা পরিদর্শন করতে হবে। এই ধরনের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টরা সম্পন্ন করবে। •

আচরনবিধি ৭: পূণ:ব্যবহার সংক্রান্ত আচরণবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
ডবভিন্ন বস্তুও অপর্যাপ্ত পূণ:ব্যবহার	অনুপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নির্মানস্থলে অতিরিক্ত সামগ্রীর কারনে সৃষ্ট ভূমি ও পানি দূষণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - • এই প্রকল্পের আওতায় কারখানা সৃষ্ট যেকোনো পদার্থ বা সামগ্রী পূণ:ব্যবহার করতে হলে তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে এবং যেসব কোম্পনী বা কারখানায় পূণ:ব্যবহারের কাচ করা হবে সেগুলোতে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের এ সংক্রান্ত সামগ্রীক আইন অনুসরণ করতে হবে। এসব কারখানা এই প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত না হলেও এই নিয়ম অনুসরণ

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
		করতে হবে। • বর্জ্য ও ফেলে দেয়া সামগ্রীর মধ্য থেকে পূণ:ব্যবহার করার মতো সামগ্রী পৃথক করতে হবে এবং সেগুলো একটি সুনিদিষ্ট স্থানে/পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। • পূণ:ব্যবহার করার মতো যেসব সামগ্রী রয়েছে তা কোনোভাবেই একটির সাথে অন্যটির মিশ্রন করা যাবে না। •

আচরনবিধি ৮: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আচরণবিধি

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
বর্জ্য নিষ্পত্তি	অনুপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নির্মানস্থলে অতিরিক্ত সামগ্রীর কারনে সৃ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - • প্রকল্পের কারখানাগুলোর নির্গমন মাত্রা প্রাথমিক অবস্থাতেই পরিবেশগত মূল্যায়ন (ইএ) দ্বারা নির্দিষ্ট করতেত হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও অন্যান্য আচরণবিধি অনুসরণ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থা থেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর এ ধরনের স্যাম্পলিং করতে হবে। কারখানা পর্যায়ে প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের জন্য একজন নির্ধারিত কর্মকর্তা তাকবেন যিনি এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন। যেই পর্যায়ে একটি ধারাবাহিক ফলাফল আসতে শুরু করবে, তখন থেকে একটি মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসিআর ৯৭ অনুযায়ি প্রতিবছর কমপক্ষে দুই বার এই মানদন্ড মনিটর করতে হবে। যদি ইসিআর ৯৭ এর মানদন্ডের সমান কিংবা তারচেয়ে বেশি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। • একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যথাযথ মানদন্ডের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। যদি কোনো ব্যতয় ঘটে তবে অবশ্যই ব্রবস্তাপ গ্রহন করতে হবে। • সব ধরনের মনিটরিংয়ের ফলাফল রেকর্ড আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। এইসব তথ্য-উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে তা পিআইইউকে সরাবরাহ করতে হবে। এই কাজের জন্য একটি গাইডলাইন প্রনয়ন করতে হবে। • এই গাইডলাইনে নির্দেশিত শর্ত অনুসরণ করতে গিয়ে কারখান থেকে সৃষ্ট নির্গমনকে কোনোভাবেই অপব্যবহার করা যাবে না। • যেখানে সম্ভব সব ধরনের রাসায়নিক পূনরুদ্ধার ও পূনর্ব্যবহার করতে হবে। • রাসায়নিক বহনকারী সব ধরনের যানবাহন অডিট প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখতে হবে। এবং এই যানবাহন

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
		অবশ্যই বীমার আওতায় থাকবে। নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যাতে এই যানবাহনে কোনো ধরনের ছিদ্র বা অন্য কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় যাতে এখান থেকে রাসায়নিকের দূর্গন্ধ ছড়িয়ে যাতে সাধারন জনজীবন আংক্রান্ত না হয়। ● কারখানা থেকে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কারখানার সীমানার অভ্যন্তরে হতে হবে।

প্রকল্প কার্যক্রম/প্রভাবের উৎস	পরিবেশগত প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা
অ্যাসিড ও রাসায়নিক সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা হলে	ভূমি ও পানি দূষণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করবেন - • যেসব এলাকা বা কক্ষে অ্যসিড বা রাসায়নিক সংরক্ষণ করা হবে সেটি অবশ্যই বিএনবিসি, ফায়ার কোড, এবং আইএলও ও ওএইচএস নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যবস্তাপনা করতে হবে। • ফ্লোরগুলো অবশ্যই যাতে দাহ্য না হয় এবং হরল পদার্থ যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে। ড্রেন/নালা বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে ফ্লোরগুলোকে রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। • ইলেকট্রিক কোড ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। যেসব স্থানে দাহ্য পদার্থ থাকবে সেখানে অবশ্যই অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এটি অবশ্যই এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষিত হতে হবে। • দাহ্য পদার্থ ও অদাহ্য পদার্থ ভিন্ন স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। • জরুরী পরিস্থিতিতে চোখ পরিস্কার ও ধোঁয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের এলাকায় কাজ করার সময় পুরো পরিস্থিতির উপরে নজরদারি করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোনো ব্যক্তি একা কাজ করার সময় বিপদাপন্ন হলে যাতে উদ্ধার করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। • যে কোনো ধরনের গ্যাস ও রাসায়নিকের সময়সীমা পেরিয়ে গেলে অথবা চাহিদা অনুযায়ি না হলে সেই গ্যাস বা রাসায়নিক কোনো ভাবেই ব্যবহার যোগ্য হবে না। • রাসায়নিকের পাত্রগুলোর গায়ে গ্রহন করার তারিখ এবং পাত্রের মুখ খোলার তারিখ সঠিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কারন অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো রাসায়নিক বাতাসের সংস্পর্শে আসলে তার গুনাগুন নষ্ট হয়ে যায়। • যেকোনো ধরনের রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়া যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করে পরিস্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত ব্যক্তিই কেবল নিযুক্ত হবে। •
অ্যাসিড ও রাসায়নিক যদি সহজলভ্য হয়	প্রমিক্ষণ নেই এমন ব্যক্তির মাধ্যমে বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে	• সব ধরনের রাসায়নিকের সংরক্ষণাগারের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্তা থাকতে হবে। • রাসায়নিকের পাত্র একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবহনের সময়ও এসব পাত্র তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে। • রাসায়নিক ও গ্যাস এর সুষ্ঠ ব্যবস্তাপনার লক্ষ্যে একটি ইনভেন্টরি ব্যবহার করতে হবে। এই ইনভেন্টরিটি ল্যাবরেটরি ম্যানেজর বা ক্লিনরুম ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় থাকতে হবে।

		• কারখানার ভিতরে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। রাসায়নিক ও গ্যাস সংরক্ষণের কক্ষে কেবলমাত্র প্রশিক্ষিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রবেশাধীকার থাকবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সাপ্তাহিক তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।